গল্প, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে **ঈমান সিরিজ**

এসো আল্লাহকে জানি

সিদ্দিক স্বপন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

আজকের শিশু-কিশোররা অনেক বেশি অগ্রসর। বিশ্বায়নের কারণে তারা এমন অনেক কিছু শিখছে, যা ওই বয়সে আমরা শিখতে পারিনি। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তারা ভাবছে, ওদের বয়সে যা আমাদের মাথাতেই আসেনি। তারা এমন কিছু প্রশ্ন করে বসছে, যা হয়তো কখনোই আমাদের ভাবনায় নাড়া দেয়নি। শিশু-কিশোরদের এই অগ্রগামিতা একদিক থেকে যেমন প্রশান্তির, অন্যদিক থেকে তেমনি উদ্‌বেগের।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, তাদের সামনে কোনো বিষয় অবতারণা করা হলে তারা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিচ্ছে না। এমনকি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও প্রশ্ন করতে ছাড় দিচ্ছে না।

শুনলাম ও মানলাম; এই উপদেশ যেন তাদের কাছে ফিকে বিষয়। এর পরিবর্তে তারা চায় যৌক্তিকভাবে মানতে, শুনতে। যেমন : আমরা যদি বলি, আল্লাহ এক। তারা পালটা প্রশ্ন করে—'আল্লাহ কেন এক?' যদি বলি ফেরেশতাদের কথা, তারা প্রশ্ন করে—'আমরা কেন ফেরেশতাদের দেখতে পাই না?' যদি বলি—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষ সমান। তারা প্রশ্ন করে বসে—'তাহলে কেউ ধনী কেউ গরিব কেন হয়? কেন সাদা ও কালো বর্ণের এই রকমফের?'

এমন নানান প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হই আমরা। বিস্তর ধারণা না থাকায় হয়তো যৌক্তিক উত্তর দিতে পারি না। ফলে এর প্রভাব হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় শিশুরা গোড়া থেকেই সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে বেড়ে ওঠে। এতে প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর সংশয়বাদিতায় ঝুঁকে যায় অনেকে। এমনকি ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব দ্বারাও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ।

কলিজার টুকরো সন্তানদের এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত রাখতে তাদের হৃদয়ে উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক উত্তর শৈশবেই সরবরাহ করতে হবে এবং এর ভাষা হবে তাদের উপযোগী।

আমাদের এই সিরিজটি ঈমানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশু-কিশোরমনে পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। শিশু-কিশোররা হয়ে উঠবে একজন সংশয়মুক্ত সাচ্চা মুসলিম।

ঈমান সিরিজটি মোট চারটি খণ্ডে বিভক্ত—

১. এসো আল্লাহকে জানি

২. প্রিয়নবির পরিচয় এবং ফেরেশতা কারা

৩. কুরআন কী বলে

৪. পরকাল ও ভাগ্য কী

ঈমানে মুফাসসাল বা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো এই সিরিজে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শিশু-কিশোররা এতে যেমন ঈমানের শিক্ষা পাবে, তেমনি পাবে সাহিত্যপাঠের অমিয় স্বাদ, যা তাদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

সূচিপত্র

আমি আল্লাহকে দেখতে পাই না কেন	৯
আল্লাহ কত বড়ো	২০
আল্লাহ কোথায়	২৬
তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল	৩১
আল্লাহ তাহলে কেমন	৩৮
আল্লাহ তাহলে একজন কেন	৪৩
কীভাবে আল্লাহ একই সঙ্গে এত কিছু করেন	৪৭
আল্লাহ ফলের জন্য গাছ সৃষ্টি করলেন কেন	৫৩
আল্লাহ কেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন	৫৭
মহাবিশ্ব সৃষ্টি করাটা কি আল্লাহর প্রয়োজন ছিল	৬১
আল্লাহ মানুষ বানালেন কেন	৬৭
আল্লাহ কেন কিছু মানুষকে কুৎসিত করে বানিয়েছেন	৭৩
আল্লাহ কেন কিছু মানুষকে অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম করেছেন	৮১
আল্লাহ কীভাবে আবারও জীবিত করবেন	৮৯
আল্লাহ কীভাবে পচে যাওয়া হাড়গুলোকে জীবন দান করবেন	৯২

আমি আল্লাহকে দেখতে পাই না কেন

তুমি কি আল্লাহকে দেখতে চাও?

কী ভাবছ?

আচ্ছা বুঝেছি। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করছ তো! ব্যাপার না। তোমার বয়সে আমারও এমনটা হতো।

এবার তাহলে আসল কথা বলা যাক। তুমি যে আল্লাহকে দেখতে চাও, এটা কিন্তু আমি খুব করেই জানি। বুঝেছ? তাই তুমি যে আল্লাহকে দেখতে চাও, এটা বলতে কখনো ভয় পেয়ো না। কারণ, তোমার মতো আমিও আল্লাহকে দেখতে চাই। আর তাইতো তোমার হৃদয়ের অনুভূতিগুলো আমি ভালোভাবেই অনুভব করতে পারি।

তাই এবার চলো। আমরা দুজন মিলেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

জানো, আমিও কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে ভেবে খুব অবাক হই। কেন জানো? কারণ, আল্লাহ ওই জ্বলজ্বলে সূর্যটাকে পৃথিবীর ওপর প্রদীপের মতো করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? ফলে তাঁর সম্পর্কে কি অবাক না হয়ে পারা যায়, বলো!

আচ্ছা, যখন রাত হয়, তুমি কী দেখতে পাও? চারদিকে আলোহীন, গহিন অন্ধকার। তাই না? আবার যদি আকাশের দিকে তাকাও কী দেখতে পাবে? দেখবে, একটি চাঁদ আর লক্ষ-কোটি তারারা মিলে সেখানে যেন আসর বসিয়েছে। নিকষ কালো অন্ধকার রাতের আকাশে যিনি লক্ষ-কোটি তারার ব্যবস্থা করলেন, তাঁর ব্যাপারে কি অবাক না হয়ে পারা যায়?

এবার পৃথিবীর দিকে তাকাও! যেন বিশাল একটা বাস্কেটবল মহাশূন্যে ঝুলে আছে। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! আমি ভুল বলেছি। এটা শুধু ঝুলেই নেই; বরং অস্বাভাবিক গতিতে সূর্যের চারপাশে ঘুরছেও বটে। জানো, আমিও না তোমার মতো আল্লাহকে দেখতে চাই। সেই আল্লাহকে, যিনি কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ছাড়াই পৃথিবীকে তার নিজ কক্ষপথে ঘোরাচ্ছেন।

আমরা কীভাবে আল্লাহর ব্যাপারে আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি, যিনি ওই সুবিশাল আকাশে পৃথিবীকে বেঁধে রেখেছেন?

কেই-বা আল্লাহর ব্যাপারে আশ্চর্য হবে না বলো, যিনি ভারী মেঘগুলো নরম তুলোর মতো আকাশে উড়তে দিচ্ছেন। অথচ মেঘগুলো সাগর ও নদীর পানি দিয়ে ভর্তি থাকে। একবার গাছগুলোর দিকে তাকাও! সেগুলো শেকড় দিয়ে কাদার ভেতর থেকে পানি শুষে নিচ্ছে। অথচ মধুর মতো মিষ্টি লাল চেরিফল, সুমিষ্ট পানিভর্তি আপেল, রসালো মাল্টা, সুন্দর লাল বীজের ডালিম ফলের ভারে এদের ডালগুলো নুয়ে পড়ে।

সেই আল্লাহকে দেখতে কে না চায়, যিনি পৃথিবীর এই সুন্দর জিনিসগুলো সৃষ্টি করছেন? তবুও কেন আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি না?

এই যে এতক্ষণ যা বললাম, সব কিন্তু তোমারই মনের ভাবনা। এসব প্রশ্ন করে নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহকে সামনাসামনি দেখতে চাও। তোমার মনের তৃষ্ণা মেটাতে চাও। আল্লাহর ওপর তোমার বিশ্বাসকে আরও পাকাপোক্ত করতে চাও। তাই না?

আমিও কিন্তু তোমার মতোই ভাবি। তোমার ভাবনার মতো আমিও আল্লাহকে সামনাসামনি দেখতে চাই। তৃষ্ণা মেটাতে চাই। তাঁর ব্যাপারে আরও জানতে চাই। আরও বেশি ভালোবাসতে চাই।

এবার তোমার বাগানের ফুলগুলোর দিকে তাকাও! গোলাপ, হাসনাহেনা, বেলী কত রকমের ফুল! নানান রঙ্গের, নানান ঘ্রাণের। একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবার নিশ্চিতভাবেই তুমি তাঁর প্রতি অবাক হবে, যিনি এই আকর্ষণীয় ফুলগুলো সৃষ্টি করেছেন। যেগুলো একটা অন্যটার চেয়ে সৌন্দর্য, রং ও সুবাসের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

ওহ! আমি তো ভুলেই গিয়েছি! গাছের ডালে কিচিরমিচির করা চড়ুইগুলোর কথা তুমি কি একটু ভাববে? একবার লম্বা সারস পাখিটির কথা ভেবে দেখো তো কিংবা শঙ্খচিলের কথা; যাদের সেন্টমার্টিন দ্বীপে ঘুরতে গিয়ে রুটির টুকরো ছুড়ে দাও।

কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করো। এবার সারাজীবন ধরে দেখে আসা পাখিগুলোর কথা চিন্তা করো তো। ভেবে দেখো, ওড়ার সময় কীভাবে তারা ডানাগুলো ঝাপটায় আর আকাশে ভেসে বেড়ায়।

কোনো কোনো পাখির আছে মিষ্টি কণ্ঠ। যেমন : কোকিল। কারও সুন্দর পালক দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। যেমন : ময়ূর। আর কেউ কত সুন্দর অবয়বে তাদের বাসা নির্মাণ করে। এরপর সেখানে সংসার পাতে; বাচ্চাদের লালন-পালন করে। যেমন : বাবুই।

আমি সেই আল্লাহর ব্যাপারে খুব আশ্চর্য হই, যিনি পাখিদের সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দিয়েছেন সুন্দর ঠোঁট, মসৃণ ডানা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ। এজন্যই তুমি আল্লাহকে দেখতে চাও। আর না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করছ, কেন আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাই না?

তুমি ঠিকই বলছ। তবে আমি কিন্তু বেঠিক নই। তাই দুজনেই ঠিক।

কীভাবে একটা অতি ক্ষুদ্র কোষ বারবার বিভাজিত হয়ে তোমাদের গরুর পেটে একটি ছোট্ট বাচ্চায় পরিণত হয়। এটা কি বিস্ময়কর নয়?

তোমার হাত, আঙুল, মুখমণ্ডল, চোখ, মুখ, জিহ্বা, কান, মাথার চুল, চোখের ভ্রুযুগল সবকিছুই দুটি ক্ষুদ্রাকার কোষের মিলনের ফলে তৈরি হয়েছে। তখন তুমি তোমার মায়ের পেটের মধ্যে খুব ছোট্ট ছিলে। এবার কি বুঝতে পারছ, এসব কত কঠিন ও জটিল কাজ!

তোমার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, মস্তিষ্ক সবগুলো অঙ্গই সঠিক জায়গায় বসানো আছে। এমনভাবে বসানো আছে, যাতে এগুলো প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে। এবার নিশ্চয় তুমি জানতে চাইবে—যে আল্লাহ আমাকে এত সুন্দরভাবে তৈরি করে সবকিছু ঠিক জায়গায় বসালেন, তাঁকে আমি দেখতে পাই না কেন?

তুমি ঠিকই ভাবছ। একদম ঠিক।

আচ্ছা এবার প্রশ্নের পালা শেষ। এখন আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো। কিন্তু শুরুতে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ, তুমি এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করোনি, যার উত্তর এককথায় দেওয়া যাবে। এটা অনেক বড়ো একটা প্রশ্ন। আর জানোই তো, বড়ো প্রশ্নের উত্তরটিও বড়ো হয়।

সবকিছুর একটা সীমা আছে

প্রত্যেক জিনিসের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন ধরো, তুমি সর্বোচ্চ কত কেজি ওজন ওঠাতে পারবে? ২০, ২৫ কিংবা ৩০ কেজি। কিন্তু ১০০ কেজি কিছুতেই পারবে না। এর কারণ, তোমার বাহুর পেশিগুলোর এবং শরীরের ওজন বহনের একটি সীমা রয়েছে। তুমি এই সীমার বাইরে কিছুই করতে পারবে না। যদি এই সীমা পার করে কিছু করার চেষ্টা করো, তবে হয় তোমার হাড় ভেঙে যাবে নয়তো তুমি অতিরিক্ত ওজনের কারণে পড়ে যাবে।

তোমার কানগুলোরও শোনার সীমা রয়েছে। ক্লাসরুমে শিক্ষকের কথাবার্তা তুমি খুব পরিষ্কারভাবে শুনতে পারবে। কিন্তু ক্লাসরুমের বাইরে থেকে পারবে না।

তোমার কণ্ঠেরও একটা সীমা রয়েছে। তুমি যত জোরে ইচ্ছা চিৎকার করতে পারবে। কিন্তু পাশের গ্রামের দাদিকে চিৎকার করে ডাকতে পারবে না। তিনি তোমার ডাক শুনতেই পাবেন না। যদি তুমি তার সাথে কথা বলতে চাও, তবে তোমার উচিত হবে মোবাইলে কল করা অথবা তার বাড়িতে যাওয়া। অবশ্য তোমার দাদিও চাইলে তোমার কাছে আসতে পারেন।

পায়ের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? তুমি সর্বোচ্চ কত দ্রুত দৌড়াতে পারবে? একটা চিতাবাঘের সমান গতিতে? কী মনে হয়?

নাহ, পারবে না। কারণ, তোমার পায়েরও একটা সীমা রয়েছে। যদিও জোরে দৌড়াও, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ফলে তোমাকে দৌড় বন্ধ করতে হবে। তারপর তুমি পানি খেতে চাইবে। বিশ্রাম নিতে চাইবে।

আচ্ছা এবার বলো, একবারে কত গ্লাস দুধ পান করতে পারবে তুমি? এক, দুই কিংবা তিন। এর বেশি না। তাই না? কারণ, তোমার পেটেরও একটা সীমা বা ধারণক্ষমতা রয়েছে।

এবার তোমার জন্য একটা প্রশ্ন।

৩ × ৫ = ?

হাসতেছ কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, আর হাসতে হবে না! আমি জানি এটা খুবই সহজ প্রশ্ন। তুমি এটা পারবে।

তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি—

২১৩৪৫৯৪ × ৭৭৭৭ = ?

কী হলো? চুপ হয়ে গেলে যে!

আমি জানি, ক্যালকুলেটর ব্যবহার না করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিনই বটে। মন খারাপ করো না কিন্তু। এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কারণ, তোমার মস্তিষ্কেরও চিন্তা করার একটা সীমা আছে।

কিছু বিষয় আছে, যা তুমি খুব সহজে বুঝবে। আবার কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে। কিন্তু সবকিছুই খুব সহজে বুঝবে না কিংবা সব প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দিতেও পারবে না।

কিছু জিনিস আছে, যা কখনোই তুমি অন্যের সাহায্য ছাড়া শিখতে পারবে না। যারা জানে তাদের থেকে এসব শিখবে। কারণ, পূর্বে যেমনটা বলেছিলাম, তোমার মস্তিষ্কেরও একটা সীমা আছে।

আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ। এবার তোমার চোখের পালা। তোমার কী মনে হয় তাদেরও নির্দিষ্ট সীমা আছে? তুমি এক পলকে যা কিছু চাও সব দেখতে পাও? এমনকি আমরা যদি আমাদের চোখ যা দেখে, তার সাথে যা দেখে না তার তুলনা করি, তাহলে তো নিজেদের অন্ধই বলতে হবে।

হতভম্ব হবে না কিন্তু! এটাই সত্যি।

দেখো, বিজ্ঞানীরা জটিল জটিল সব গণনা করে বের করেছেন। যেমন : এই মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ হলো, ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। সবাই জানে, এটি একটি বড়ো সংখ্যা। কিন্তু এটি বোঝা কঠিন যে, সংখ্যাটি আসলেই কত বড়ো!

আমরা কখনোই ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের এই মহাবিশ্বের ৭০ শতাংশই জানতে পারব না। দেখতেও পারব না। বিজ্ঞানীরা এই ৭০ শতাংশকে বলেন 'ডার্ক এনার্জি'। বাকি ৩০ শতাংশের মধ্যে ২৫ শতাংশ হলো অদৃশ্য বস্তু। এদের অদৃশ্য বস্তু বলার কারণ হলো, আমরা এদের কখনোই দেখতে পারব না। অনেক অনেক চেষ্টা করলেও না।

তাহলে বাকি থাকল মাত্র ৫ শতাংশ।

আসলে আমরা যা কিছু শুনি ও দেখি তার সবই এই ৫ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা ভেবে আনন্দিত হয়ো না যে, আমরা ৫ শতাংশ তো দেখি। এটাই-বা কম কীসে!

কারণ হলো, মানুষের চোখ এই ৫ শতাংশের সবকিছু দেখে না। আমরা বড়োজোর সামান্য ভগ্নাংশ পরিমাণ অংশ দেখতে পাই। যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছিলাম; মহাবিশ্বের বিচারে আমাদের নিজেদের অন্ধ বলতে হবে।

সোজা কথায় বলতে গেলে, আমরা মহাবিশ্বের যে পরিমাণ অংশ দেখতে পাই, তা পুরো মহাবিশ্বের তুলনায় একটা পিঁপড়ার পায়ের সমানও হবে না। আমি কিন্তু পুরো পিঁপড়ের কথা বলিনি। বলেছি ক্ষুদ্র পিঁপড়ের পায়ের কথা। সেই পা কত বড়ো, এবার তুমি চিন্তা করে দেখতে পারো।

এখন তুমিই বলো, যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করি, আমাদের চোখ সেটাই ভালোভাবে দেখতে পায় না। আর সেই চোখ কীভাবে মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে দেখবে, যিনি দেখতে কোনো সৃষ্টির মতো নন।

আল্লাহকে সরাসরি দেখা সম্ভব নয়

কিছু মানুষ বলে, আমি এমন কিছুতে বিশ্বাস করব না, যা দেখতে পাই না। এমন কিছুতে বিশ্বাস রাখব না, যা দেখতে পাই না; এমনকি আল্লাহতেও বিশ্বাস করব না! কারণ, আমি তাঁকে দেখতে পাই না।

এটি খুবই হাস্যকর একটি কথা। কারণ, এমন অসংখ্য জিনিস আছে, যেগুলো আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আছে। চলো একপলক সেগুলো দেখে নিই। যেমন : মহাকর্ষ বল, মানুষের মন, সুখ, ভালোবাসা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি।

তুমি নিশ্চয় জানো এগুলো কী, তাই না? কিন্তু তোমার চোখ দিয়ে কখনো দেখছ এই জিনিসগুলো? কারও পক্ষে কি এগুলো দেখা সম্ভব? মূল কথা হচ্ছে, আমাদের সবকিছুর দেখার প্রয়োজনও নেই। আর আমরা পারবও না বটে।

কোনো কিছু দেখতে না পারার অর্থ এই না যে, সেই জিনিসটার অস্তিত্ব সেখানে নেই। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা দেখতে পাই না। তাই, যদিও আমরা আল্লাহকে দেখতে পাই না; তারপরও আমরা জানি, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

আমাদের প্রয়োজন আল্লাহকে দেখা নয়, তাঁকে বিশ্বাস করা

আমাদের আল্লাহকে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা চলো, তোমাকে আমি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এই উদাহরণটি তোমার প্রশ্নগুলোকে বাতিঘরের মতো উজ্জ্বল করে বুঝতে সহায়তা করবে।

চলো, একটা আর্ট গ্যালারিতে যাই। শিল্পীদের সুন্দর সুন্দর চিত্রকর্মগুলোর দিকে তাকাও তো। দেওয়ালে লটকানো বিশালাকৃতির ক্যানভাসটাকে দেখো একবার। ক্যানভাসের ছবিটি লক্ষ করো। সোনালি রঙের ছোঁয়ায় আঁকা পাহাড়ি বনফুলে ভরপুর এক জনবসতি।

পাহাড়ের ওপরে নীল আকাশ ছেয়ে আছে। আকাশের ভাসমান মেঘগুলো সাদা বনফুলের মতোই সাদা। এরপর ধূসর পাখিগুলো আকাশে উড়ছে। অনেকগুলো একসাথে। দূরে একটা সবুজ ঘন বন দেখা যাচ্ছে।

এবার, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। কিছু প্রশ্ন তোমার কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। তবুও উত্তর দিতে হবে কিন্তু।

‘ছবিটা সুন্দর না?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই অনেক সুন্দর।’

‘এই ছবিটা কে এঁকেছে?’

‘নিশ্চয় একজন শিল্পী।’

‘তুমি কি তাকে আঁকতে দেখেছ?’

‘না। দেখিনি।’

‘তাহলে কীভাবে তুমি জানলে, একজন শিল্পী এটি এঁকেছেন?’

‘কারণ, আমি জানি একজন শিল্পীই পারেন এই রকম ছবি আঁকতে। আর কেউ পারবে না।’

‘কিন্তু তুমি তো শিল্পীকে দেখোনি!’

‘কিন্তু আমি তো ছবিটা দেখেছি। আমি বনফুল, আকাশ, ধূসর পাখি ও মেঘগুলোকে দেখেছি। তাই এগুলো আপনা-আপনি তৈরি হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব।’

‘আচ্ছা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, টেবিলের ওপর রাখা রং ও তুলিরা নিজেরা পরামর্শ করে ছবিটা এঁকেছে। পারে নাকি?’

‘আপনি বলেছিলেন আপনার কোনো প্রশ্ন হাস্যকর হতে পারে। কিন্তু এতটা হাস্যকর হবে তা ভাবিনি। ছবিকে ছাড়ুন, একটা রঙের তুলি এই রকম আঁকতে পারে না। অসম্ভব!’

‘তুমি নিশ্চিত তো?’

‘অবশ্যই। আমি সুনিশ্চিতভাবেই বলছি। ছবি আঁকার জন্য অবশ্যই শিল্পীর প্রয়োজন হবে।’

‘কিন্তু শিল্পী তো আশেপাশে নেই। নাকি সে ছবির ভেতরে ঢুকে এঁকেছে এসব?’

‘এটা কীভাবে সম্ভব? শিল্পীর তো বাইরে থাকার কথা।’

‘রং ও তুলির ব্যাপারে তোমার মত কী? এগুলোর মধ্যে একটা তো শিল্পী হতে পারে।’

‘আপনি এসব কী বলছেন! হাজার বছর ধরে রং, তুলি সেখানে পড়ে থাকলেও তারা কোনো ছবি আঁকতে পারবে না।’

‘কেন পারবে না?’

‘কারণ, তাদের বুদ্ধি নেই। তাদের সেই ক্ষমতা নেই। আর তাদের তো প্রাণও নেই।’

‘বাহ! তোমার উত্তরগুলো অসাধারণ হয়েছে।’

এবার চলো আমরা আমাদের আলোচনাকে আর্ট গ্যালারির বাইরে নিয়ে যাই।

এই জায়গাটির দিকে দেখো তো।

আমরা এখন আছি একটা পাহাড়ের চূড়ায়। আমাদের চারপাশে শুধু বনফুল আর বনফুল। আকাশটা নীল। আর নীল সেই আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা বনফুলের মতো সাদা মেঘ। পাখিদের দিকে লক্ষ করো, কীভাবে কিচিরমিচির করছে তারা। ওড়ার সময়ে কত খুশি দেখাচ্ছে তাদের।

‘আচ্ছা দেখো তো, এই জায়গাটি কেমন মনে হচ্ছে? আমরা কিছুক্ষণ আগে যে ছবির কথা আলোচনা করলাম, এটা দেখতে তার মতোই অনেকটা। কী বলো তুমি?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু এটা অতুলনীয় সুন্দর। কারণ, এখানকার সবই জীবন্ত।’

‘তোমার কি মনে হয় এই জায়গাটা ছবির থেকেও সুন্দর?’

‘অবশ্যই। এখানকার দৃশ্যগুলো আরও সুন্দর।’

‘ঠিক আছে। ছবিটা যদি নিজে নিজে তৈরি না হতে পারে, তাহলে আমরা এখ ন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা কি আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে? ভেবে উত্তর দিয়ো কিন্তু।’

‘অবশ্যই না। এসব সৃষ্টি...’

‘থামো থামো! এখনই উত্তর দিয়ো না।’

এখন তোমার চারপাশে ভালো করে লক্ষ করো তো। কোনো কথা বলা যাবে না কিন্তু। কিছুক্ষণ চুপ থাকতে হবে। চলো আরও ভালোভাবে সব দেখি। এবার সোনালি রং থাকা সাদা বনফুলগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো। চলো তাদের পাতাগুলো গুনি। তাদের রংটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। চিন্তা করো, কীভাবে হলুদ রঙের সাথে সাদা রং একই সাথে থাকে।

সবুজ ঘাসগুলোকে দেখো। যেন মনোরম সবুজ রঙের কার্পেট মাটিতে বিছানো। ওই যে ওখানে দেখো, মৌমাছিরা ফুলের ওপর কীভাবে নেচে নেচে উড়ছে। পরিশ্রমী পিঁপড়ারা গাছের ডালে ডালে দ্রুত দৌড়াচ্ছে।

একটু গভীর শ্বাস নাও। সুগন্ধ পাচ্ছ না? বাড়ন্ত পোস্তগাছগুলোর ব্যাপারে তোমার ধারণা কী? এত সুন্দর রং তুমি আর কোথাও পাবে কি? প্রজাপতির অপূর্ব ডানাগুলো দেখো! কাছে গিয়ে দেখো! কিন্তু ধরো না যেন! এগুলো অপরূপ সুন্দর!

চলো, এবার আমাদের পিঠ মাটির ওপরের ঘাসের সবুজ কার্পেটে ঠেকিয়ে নীলাভ আকাশটা দেখি। আকাশ! নীল সুন্দর আকাশ! বনফুলের মতো সাদা তুলোর মেঘগুলো!

সারসগুলো তাদের বড়ো, মসৃণ ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাচ্ছে! দূরে ঘন সবুজ বন! তুমি কি গাছের সবুজ চূড়াগুলো দেখতে পাচ্ছ? গাছগুলো কতই-না সুন্দর।

‘এখন আমাকে বলো! এত সুন্দর দৃশ্যগুলো কোনো শিল্পীর হাতের ছোঁয়া ব্যতীত আঁকা হয়েছে, সেই আর্ট গ্যালারির ছবিটার মতো। তাই না?’

‘না! না! কখনোই না! এসব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।’

‘কিন্তু তুমি তো আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ না!’

‘এটা কোনো কথা হলো? আমি তাঁর সৃষ্টি করা ফুল, পাখি, মৌমাছি ও প্রজাপতি দেখেছি। নীল আকাশ ও সেখানে ভাসমান মেঘ দেখেছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমি শ্বাস ভরে ফুলের মনোমুগ্ধকর সুবাস নিয়েছি। বনফুলের স্নিগ্ধ পাতাগুলো ছুঁয়ে দেখেছি। আকাশের সাদা মেঘ গুনেছি। ডানা ঝাপটিয়ে পাখিদের তাদের নীড়ের উদ্দেশে উড়তে দেখেছি।

যদিও আল্লাহকে দেখিনি, কিন্তু না দেখেই আমি তাঁকে দেখার মতোই বিশ্বাস করি। এই সুন্দর জিনিসগুলো এবং পৃথিবীর বাকি সব অপরূপ জিনিস তাঁরই সৃষ্টি।’

সর্বশেষ প্রশ্ন

এখন এই ধরনের একটা প্রশ্ন তোমার মাথায় আসতে পারে—'আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা আল্লাহকে দেখতে পারব না। কিন্তু আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি কি আমাদের সামনে এসে দেখা দিতে পারেন না?'

আমি শুরুতেই বলেছিলাম, আল্লাহকে দেখার ও জানার এই আগ্রহকে আমি বাহবা দিই। আবার এটা ঠিক, আল্লাহর সব বান্দাই তাঁকে দেখতে চায়। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাদের স্রষ্টা! কেমন দেখতে তিনি!

আর আল্লাহ আমাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন। তবে তিনি আমাদের দেখা দেবেন, যেভাবে তিনি চান। কিন্তু সেই দেখা এই পৃথিবীতে হবে না; হবে জান্নাতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আল্লাহ তোমাদের কিছু দিতে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তা পূর্ণ করবেন।

জান্নাতিরা বলবে—তিনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেননি? তিনি কি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে রাখেননি?

এরপর আল্লাহ জান্নাতিদের সামনে তাঁর পর্দা সরিয়ে ফেলবেন। জান্নাতিদের কাছে ওই সময়ে আল্লাহ দয়াময় ও মহিমান্বিতকে দেখার চাইতে কোনো কিছুই অতটা প্রিয় হবে না। এতদিন যা পেয়েছে, তা তুচ্ছ মনে হবে।

এবার বইয়ের শুরুতে আমি যা বলেছিলাম মনে করো তো। বলেছিলাম, প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে।